রবিবার, ৫ শ্রাবণ, ১৪২৫
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ২০৫

লোকসভা নির্বাচনে একা লড়ার ইঙ্গিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

২১ জুলাই শহিদদিবস উপলক্ষ্যে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কলকাতার ধর্মতলায় আয়োজিত সভায় দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন, আগামী লোকসভা নির্বাচন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য। ৩৪ বছরকাল ধরে এরাজ্যে ক্ষমতায় থাকার পর বামফ্রন্টকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে ক্ষমতায় এসেছে তাঁর সরকার। তাই কোনওভাবেই যে বামেদের সঙ্গে নেবেন না, সেকথা সুপ্রিমো স্পষ্ট করে দিলেন। বরংচ্ছ জাতীয় কংগ্রেসের জন্য কিছুটা নরম ভূমিকা নিলেও খোলাখুলি জানিয়ে দেন যে, কেন্দ্রে সাহায্য চাইবেন আর রাজ্যে বিরোধিতা করবেন, এটা মেনে নেওয়া যায় না। অর্থাৎ থাকলে কেন্দ্রে ও রাজ্যে সমানভাবে পাশে থাকতে হবে, এমনটাই অভিমত ব্যক্ত করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, ওরা তালিবানি হিন্দুত্ববাদ দেখাচ্ছে। এই বাংলার মাটি সকল ধর্মের, সকল বর্ণের, সকল জাতির, একথা সভাস্থল থেকে মনে করিয়ে দেন তিনি। অর্থাৎ, এই বাংলায় যে সাম্প্রদায়িক খেলা চলবে না তিনি স্পষ্টতই তা জানিয়ে দেন। সভাস্থলে প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে লক্ষ লক্ষ মানুষের জমায়েত প্রসঙ্গে তাঁর উক্তিও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, এখানে এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁরা শহিদদের স্মরণে প্রণাম জানাতে এসেছেন। এই উপলব্ধি আন্তরিক, এটা টাকা দিয়ে কেনা যায় না। ফলত, এই মঞ্চে দলের সুপ্রিমো যে লোকসভা নির্বাচনে একাই লড়ার ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন তা পরিষ্কার। কারণ, তাঁর কণ্ঠে এদিন উচ্চারিত হল, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে'।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

গলার অসুখের জন্য কাতর হইয়াছেন। মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)— এক একবার ভাবি দেহটা খোল মাত্র; **সেই অখণ্ড (সচ্চিদানন্দ) বই আর কিছু নাই।**

''ভাবাবেশ হলে গলার অসুখটা একপাশে পড়ে থাকে। এখন ঐ ভাবটা একটু একটু হচ্ছে, আর হাসি পাচ্ছে।

দ্বিজর ভগিনী ও ছোট দিদিমা ঠাকুরের অসুখ শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা প্রণাম করিয়া ঘরের একপাশ বসিলেন দ্বিজর দিদিমাকে দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন, ''ইনি কে?— যিনি দ্বিজকে মানুষ করেছেন? আচ্ছা দ্বিজ এমন এমন **(একতারা)** কিনেছে কেন?''

মাষ্টার --- আজ্ঞা, তাতে দুইতার আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—একে ওর বাবা বিরুদ্ধ; সব্বাই কি বলবে? ওর পক্ষে **গোপনে (ঈশ্বরকে) ডাকাই ভাল।**

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে দেয়ালে ঠাঙ্গান গৌর নিতাইয়ের ছবি একখানা বেশী ছিল; গৌর নিতাই সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন করছেন এই ছবি।

রামলাল (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—তা হলে, ছবিখানি এঁকেই (মাষ্টারকে) দিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ--- আচ্ছা, তা বেশ।

(শ্রীরামকৃষ্ণ ও হরিশের সেবা)

ঠাকুর কয়েকদিন প্রতাপের ঔষধ খাইতেছেন। গভীর রাত্রে উঠিয়া পড়িয়াছেন, প্রাণ আই-ঢাই করিতেছে। হরিশ সেবা করেন, ঐ ঘরেই ছিলেন; রাখালও আছেন; শ্রীযুক্ত রামলাল বাহিরে বারান্দায় শুইয়া আছেন। ঠাকুর পরে বলিলেন, ''প্রাণ আই ঢাই করাতে হরিশকে জড়াতে ইচ্ছা হ'ল; মধ্যম নারায়ণ তেল দেওয়াতে ভাল হলাম তখন আবার নাচতে লাগলাম।''

দিনপঞ্জিকা

৫ শ্রাবণ, ভাঃ ৩১ আষাঢ়, **২২ জুলাই**, ৫ শাওন, সংবৎ ১০ আষাঢ় সুদি, ৮ জেক্সদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৬, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২২। **রবিবার**, দশমী অপরাহ্ণ ঘ ৫।৩৫ মিঃ। বিশাখানক্ষত্র দিবা ঘ ২।২৫ মিঃ। শুভযোগ দিবা ঘ ১১।৪৪ মিঃ। তৈতিলকরণ, প্রাতঃ ঘ ৫।৩০ গতে গড়করণ, অপরাহ্ণ ঘ ৫।৩৫ গতে বণিজকরণ। **জন্মে**--- তুলারাশি শুদ্ধবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ঘ ৮।১৩ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দিবা ঘ ২।২৫ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। **মৃতে**--- ত্রিপাদদোষ, দিবা ঘ ২।২৫ গতে একপাদদোষ। **যোগিনী**— উত্তরে, অপরাহ্ণ ঘ ৫।৩৫ গতে অগ্নিকোণে। **বারবেলাদি** ঘ ১০।৪ গতে ১।২৩ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১।৪ গতে ২।২৫ মধ্যে। **যাত্রা**--- নাই, দিবা ঘ ২।২৫ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে ও উত্তরে নিষেধ, অপরাহ্ণ ঘ ৫।৩৫ গতে পুনঃযাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**— গর্ভাধান দীক্ষা হলপ্রভাব বীজবপন পুণ্যাহ ধান্যরোপন অপরাহ্ণ ঘ ৫।৩৫ মধ্যে **অন্নপ্রাশন** নবান্ন যবশ্রাদ্ধ দিবা ঘ ২।২৫ গতে বিষ্ণ্যারম্ভ। **বিবিধ**— দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **স্মার্ত্ত ও উৎকল মতে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের পুনঃযাত্রা** (উল্টো রথ)। অপরাহ্ণ ঘ ৫।৩৫ মধ্যে **মন্ত্রস্নান দানাদি ও অনধ্যায়। বহুধা যাত্রা (উৎকল)।** অপরাহ্ণ ঘ ৫।৩৫ গতে রাত্রি ঘ ৮।৪৫ মধ্যে **স্মার্ত্তমতে শ্রীশ্রী হরির শয়ন। প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্মদিবস। মাহেন্দ্রযোগ**— দিবা ঘ ৬।৪ মধ্যে ও ১।০ গতে ১।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।৫৮ গতে ৭।৪১ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ৩।০ মধ্যে। **অমৃতযোগ**--- দিবা ঘ ৬।০৪ গতে ৯।৩২ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৪১ গতে ৯।৮ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

৫ শ্রাবণ, ভাঃ ৩১ আষাঢ়, **২২ জুলাই**, ৮ জিল্কদ, ৫ শাওন, উঃ ৫/০৪, অঃ ৬/২০, রবিবার, দশমী অপঃ ঘ ৫/৩৪, সেহরী শেষ ৩/৩৩, ইফতার ৬/২৭।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

আরাকান-এ বাংলা সাহিত্য চর্চা

অধ্যাপক পীরুপদ মালিক
রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়,
চাঁপাডাঙ্গা, হুগলি
পর্ব ১

'প্রেম বিনে ভাব নাহি, ভাব বিনে রস
ত্রিভুবনে যত দেখি প্রেম হস্তে বশ',

এ কথা বাংলার নবদ্বীপে শোনা যায়নি, শোনা গিয়েছিল সুদূর 'আরাকানে'। দক্ষিণ এশিয়ার একটি অন্যতম দেশ মায়ানমার। এই মায়ানমার প্রদেশের অন্তর্গত আরাকান অঞ্চল। খ্রস্টপূর্ব ২৬৬৬ অব্দ থেকে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর ধরে এর স্বাধীন সত্তা, সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা, রাজনৈতিক ঐতিহ্য প্রভৃতি ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। ভৌগোলিক অবস্থানের দিকে তাকালে উত্তরে চীন ও ভারত, দক্ষিণে ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগার, পূর্বে মায়ানমারের সীমান্তবর্তী 'ইয়োমা' পর্বতমালা। এই সুদীর্ঘ, দুর্গম সুউচ্চ ও বিশাল 'ইয়োমা' পর্বতমালা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো আরাকানকে মায়ানমার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। মায়ানমারের সাথে দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলেই সুদীর্ঘ কালব্যাপী আরাকানের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য ও নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব হয়েছিল।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তবর্তী একটি অঞ্চল আরাকান। এই বাংলাদেশের সাথে আরাকানের সীমা প্রায়ই পরিবর্তন হতো। বাংলাদেশের কক্সবাজার, রামু ও চট্টগ্রামসহ একটি বিশাল অংশ দীর্ঘদিন যাবৎ আরাকানের শাসনাধীনে ছিল। ১১৬৬ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খান কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয়ের পর থেকেই কেবল এর আয়তন সঠিক অর্থে নির্ধারিত হয়। এই হিসাবে ব্রিটিশ শাসন পর্যন্ত আরাকানের আয়তন ছিল ২০০০০ বর্গমাইল। আরাকানের মানচিত্র অনেকটা বোয়াল মাছের মতো। এর দৈর্ঘ্য ৩৬০ মাইল কিন্তু প্রস্থে স্থান বিশেষে ভিন্নতা রয়েছে। সমগ্র আরাকান অঞ্চল উত্তর-পশ্চিমে ১৭১ মাইলব্যাপী নৌ ও স্থল সীমারেখা সহকারে বাংলাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত।

আরাকানে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নদী আছে যথা নাফ, মায়ু, কালাদান, লেমরু, অনন, তানগু প্রভৃতি। এর মধ্যে নাফ, কালাদান, লেমরু ও মায়ু আরাকানের প্রধান প্রধান নদী। এই নাফ নদীটি প্রস্থে ছোট মনে হলেও বেশ খরস্রোতা। এটি বাংলাদেশ ও আরাকানের মধ্যকার আন্তর্জাতিক সীমারেখা হিসাবে কাজ করে। নাফ নদীর পূর্ব-তীরে আরাকানের মংডু টাউনশীল ও পশ্চিমতীরে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার টেকনাফ অঞ্চল।

আরাকানের মোট আয়তনের প্রায় ৭০ ভাগ পাহাড় ও বনাঞ্চল সমৃদ্ধ। এখানকার বনাঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নতমানের কাঠ উৎপন্ন হয়। তার মধ্যে সেগুনকাঠ ভারতের বাজারে যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। গোটা মায়ানমারে মোট উৎপাদিত কাঠের প্রায় ১৫ শতাংশ কাঠ আরাকান থেকে উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার ভাষ্য ও আরাকানের মুসলিম লেখকদের মতানুসারে আরাকানের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ। তার মধ্যে ৩০ লক্ষ মুসলমান যা প্রায় সমগ্র জনগোষ্ঠীর ৬০ শতাংশ।

'আরাকান' নামটি অনেক পুরাতন হলেও বর্তমানে সরকারি নথিপত্রে এ নামটি বিলুপ্ত প্রায়। মায়ানমারের সামরিক শাসন নে উইন ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের নাম পরিবর্তন করে 'রাখাইন স্টেট' নামকরণ করে এটিকে একটি অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা দিয়েছে।[১] সে অবধি সরকারি ভাবে আরাকানকে 'রাখাইন স্টেট' নামে অভিহিত করা হয়। তবে প্রাচীনকালে আরাকানীরা তাদের জন্মভূমিকে 'রখইঙ্গ' নামে অভিহিত করতো। এই রখইঙ্গ শব্দটি সংস্কৃত 'রক্ষ' এবং পালি 'যক্খো' অর্থাৎ রক্ষ ও যক্ষ শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে মনে করা হয়। কেননা বৌদ্ধরা লঙ্কা বা সিংহল অর্থাৎ আধুনিক শ্রীলঙ্কা জয় করার পূর্বে আরাকানের আদিম অধিবাসীদের রক্ষ বা যক্ষ নামেই অভিহিত করত। অনুরূপভাবে ভারতীয় আর্যরা আরাকানের দ্রাবিড় ও মঙ্গলীয়দের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবার পূর্বে এ নামে অভিহিত করতেন।

আরাকানে বাংলা সাহিত্য বিকাশের কারণ ঃ

আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য কিংবা রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্য কথাগুলো অনেক সময় বাংলা সাহিত্যের পরিচিত মহলকে অবাক করে দেয়। কেননা আরাকান বাংলার কোন অংশ নয় বরং এটি বার্মা বা মায়ানমারের পার্শ্ববর্তী এককালের স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য হলেও বর্তমানে 'রাখাইন স্টেট' নামে পরিচিত তাদেরই একটি রাজ্য। সেখানে বাংলা সাহিত্যের চর্চা শুধু নয়, মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের রাজত্ব ছিল আরাকানে অবস্থানরত কবিদের হাতে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি একটি চমকপ্রদ ঘটনা বৈকি। সাধারণত রাজনীতির সুস্থ আবহাওয়ায় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিকাশ সাধিত হয়; অন্যদিকে রাজনৈতিক অরাজকতায় দেশে প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা-সভ্যতা, সংস্কৃতি-সাহিত্য প্রভৃতি চর্চা শূন্যতার কোঠায় ওঠে। বাংলার ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতকের সাহিত্য শূন্যতার জন্য অনেকে রাজ্যের অস্থিতিশীল পরিবেশকেই দায়ী করেছেন। অথচ আরাকানে এ ধরনের বক্তব্যের কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। কেননা ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রাম অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বাংলা ও ত্রিপুরা এবং বার্মার আধ্যাসী ও প্রতিশোধনীতির প্রেক্ষিতে আরাকানকে সমসময় ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। অথচ এত বিপর্যয় ও সমস্যার পরও সেখানে বাংলার উন্নত গৌড়ীয় মুসলিম সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ থেমে থাকেনি। সুত্রাকারে সেই কারণগুলি এবার দেখে নেওয়া যাক—

প্রথমত ঃ- একসময় চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল একই গোত্রীয়। অর্থাৎ খ্রিস্ট পূর্বের বাঙ্গালী অস্ট্রো-এশীয় ও ভোট-চীন গোত্রীয়। আর খ্রিস্টাব্দের পর ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ও বৌদ্ধরা তাদের উন্নততর ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে এসব অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে। পরে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে আরব মুসলিম বণিকগণ এই সব এলাকায় ইসলাম প্রচারের জন্য আসেন। ফলে বাংলার সাথে আরাকানের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত ঃ- আরাকান স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য হলেও বার্মা প্রায়ই আধ্যাসী হামলা চালাতো এই রাজ্যের উপর। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরাকান রাজ মিনসুয়ামুন ওরফে নরমিখলা স্বীয় রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দীর্ঘ চব্বিশ বছর বাংলায় অবস্থান করার পর সুলতান জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহ স্বসৈন্যে তার স্বীয় রাজ্য উদ্ধার করে ফেলে। ফলত সেই সময় ইসলামী রীতি, পদ্ধতি ও সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার আদর্শিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয়ত ঃ- চট্টগ্রামের দখল নিয়ে আরাকান রাজার সঙ্গে গৌড়ের রাজার মধ্যে প্রায় যুদ্ধ লেগেই থাকত। তা সত্ত্বেও আরাকানরা গৌড়ীয় সভ্যতা সংস্কৃতিকে পরিহার না করে ব্যাপকভাবেই গ্রহণ করেছিল। ফলে বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির সাথে আরাকানী মুসলমানদের মাঝে গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

চতুর্থত ঃ- আরাকান রাজ্য পুনরুদ্ধারে গৌড়াধিপতির সহায়তার পরোক্ষ ফল হিসাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরির সূত্রে আরাকানে বাংলার মুসলমানদের আগমনের পথ সুগম হয়। এছাড়া চট্টগ্রাম অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে আরাকান রাজ্যের অধীনে শাসিত হবার ফলে পূর্ববাংলা সহ চট্টগ্রামের মুসলমানগণ নিজের দেশ হিসাবে আরাকানে গিয়ে চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে এবং অনেকেই সেখানে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে। ফলে বাংলা সাহিত্য চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

পঞ্চম মত ঃ- আরাকানের রাজসভার প্রধানমন্ত্রী, অমাত্য, সমরসচিব, মন্ত্রী, কাজি বা দেওয়ানী ফৌজদারী বিচারক হিসেবে মুসলমানদের নিয়োগ শুধু ছিল না, রাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের সততা-আন্তরিকতা ও দেশপ্রেমের অনেক সুখ্যাতিও ছিল। তাঁরাই ছিলেন রাজার প্রধান উপদেষ্টা। অভিষেক অনুষ্ঠান সহ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সমূহ তাদের দ্বারাই পরিচালিত হত। যেহেতু তাদের অধিকাংশেরই আদি নিবাস ছিল চট্টগ্রাম কিংবা সিলেট অঞ্চল। সুতরাং রাজসভায় তাদের প্রতিষ্ঠা সূত্রে আরাকানে নিজেদের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে তারা ব্যাপক সুযোগ পান। গৌড়ীয় মুসলিম সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সভ্যতা আরাকানীদের চেয়ে উন্নত হবার কারণে শাসকদের পক্ষ থেকে কোন বাধা না এসে বরং সহযোগিতার পরিবেশ পাওয়া গেছে।

ক্রমশ

আজ উল্টো রথ

ড: প্রসেনজিৎ সরকার

উৎসবপ্রিয় বাঙালি জাতি সারা বছরই কোনও না কোনও উৎসবে নিবেদিত প্রাণ। এই রকমই একটি উৎসব হলো শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা, যা ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তথা সমগ্র হিন্দুসমাজে অন্যতম প্রধান ও পবিত্র উৎসব হিসেবেই গণ্য হয়ে থাকে। 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ' ও 'পদ্মপুরাণ' নামক প্রাচীন গ্রন্থে রথযাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে জানা যায়, প্রাচীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ (যেমন— সৌর, শক্তি, শৈব, বৈষ্ণব, জৈন, বৌদ্ধ) স্বীয় উপাস্য দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে রথযাত্রা উৎসব পালন করতেন। বৌদ্ধযুগেও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বুদ্ধদেবের মূর্তি স্থাপন করে রথযাত্রার প্রচলন ছিল। পশ্চিমবঙ্গে রথযাত্রা উৎসব মহাসমারোহে এবং ধর্মপ্রাণ মানুষের ভক্তিরসে জারিত হয়ে পালিত হয়ে আসছে।

ষড় ঋতুর দ্বিতীয় ঋতু মানে আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়ার্ধে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব শুরু হয়। এর এক সপ্তাহ পর উল্টোরথ উৎসব হয়ে থাকে। রথোপরি ডানে প্রভু জগন্নাথ মাঝখানে তাঁর বোন সুভদ্রা এবং বামে বলভদ্র ভক্তদের বিশ্বাস, রথোপরি আসীন দেবমূর্তি দর্শন ও রথ টেনে নেওয়ার সুযোগ তাঁদের জন্য দেবতার আশীর্বাদ লাভের সহায়ক। কঠোপনিষদে আছে আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।। (কাঠ, উপ-১.২.৩) অবস্থানকারী। রথ হলো শরীর বা দেহযন্ত্র। বুদ্ধি হলো সারথি বা চালক। মনকে লাগামের সঙ্গে তুলা করা হয়েছে। ইন্দ্রীয়গুলো অর্থাৎ অশ্ব বা ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে শুরু হয়ে নয় দিনব্যাপী চলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব। আষাঢ়স্য দ্বিতীয়ায়ং রথং কু র্যাদ - বিশেষত ঃ।/ আষাঢ়শুক্লৈকাদিশ্যাং জপ হোম মহোৎসব। (পদ্মপুরাণ) অর্থাৎ আষাঢ় মাসের দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা অনুষ্ঠান করে শুক্লা একাদশীর দিন উল্টোরথ বা পুনঃযাত্রা করতে হবে। এই সময়ে জপ, হোম করা বিধেয়। আজ সেই উল্টো রথযাত্রা উৎসব। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতী রাধার কুঞ্জে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু পথে চন্দ্রাবলী আটকে দিল। ফলে দেরি হয়েছিল বলে শ্রীমতী রাধার কাছে যাওয়ার পর প্রসঙ্গত বলেছিল— 'দেহ রথে যদি না-ই এলে প্রভু, মনোরথে কেন এলে না?' আমরা আমাদের মনোরথকে নিয়ে যাব শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের উল্টো রথযাত্রায়। মানুষের জীবনে রথ হল বিশেষ প্রতীক। পার্থিব ভোগের পথ ছেড়ে মুক্তির পথে যেতে চায়, তার জীবন সুনিয়ন্ত্রিত হয়। রথের রথী হল— অন্তর্যামী, তিনি নির্লিপ্ত। তারই উপযুক্ত স্বরূপ নির্লিপ্ততা, মানুষের জীবনে দেহ রথের মধ্যেই তা উপলব্ধি হবে। যিনি উপলব্ধি করতে পারেন, তিনি হলেন রথী। আর রথী দর্শনই হল মুক্তি। মানবজীবনে কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে অনেকে সোজারথ দেখার সুযোগ পান না। বা শারীরিক কারণে দর্শন করতে পারেন না। তাদেরকে নিজেই কৃপা করে দর্শন দেয়। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে রথযাত্রায় মন্দিরে প্রবেশ করে। যাকে বলা হয় উল্টোরথ। ১৯১৯ মি: জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার রথযাত্রা উৎসব প্রচলিত হয়। তার পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে উল্টোরথ প্রচলিত। সোজা রথযাত্রা থেকে উল্টো রথযাত্রা চলমান উৎসব। মন্দিরে বিগ্রহের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

এই সময় সাধারণের প্রবেশ নিষেধ থাকে। কিন্তু এই উৎসবে ধর্ম, বর্ণ প্রভেদ ভুলে গিয়ে সকলেই অংশগ্রহণ করে। বর্ষার পূর্ণলগ্নে জগন্নাথদেবের নিকট মানবজাতির কল্যাণে প্রার্থনা। তিনি যেন পৃথিবীর সকল মানুষকে সুখে শান্তিতে ও আনন্দে রাখেন।

সম্পাদক সমীপেষু

দশে আট

দশে দশ হলে খুব ভালো হতো। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দশে দশ হয়ে ওঠেনা। এখানে এমন দুজন শিল্পীর নাম বলা হচ্ছে যাঁরা বাংলা ছায়াছবির জগতে সেরার সেরা বলতে পারেন। এনারা এসেছিলেন এবং দর্শকদের মন জয় করে নিয়ে গেছেন। একজনকে অনেক বছর আগেই আমরা হারিয়েছি। অপরজন আজও আমাদের পাশে রয়েছেন। সময় বিশেষে তার অভিনয় আমরা দেখতে পাই। এই দুজন শিল্পী হলেন মহানায়ক উত্তমকুমার ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। দুজনেই অভিনয়ের প্রতিভা দেখিয়ে গেছেন। বাংলা ছায়াছবিতে উত্তমকুমার ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের যে অবদান রয়েছে, তা বোধহয় বাংলার দর্শকেরা কোনও দিনই ভুলতে পারবে না। উত্তমকুমার দৃষ্টিদান ছবি দিয়ে (মুক্তিপ্রাপ্ত) অভিনয়ের জগতে প্রবেশ করেছিলেন। সৌমিত্রবাবু সত্যজিৎ রায়ের অপুর সংসার ছবি দিয়ে অভিনয়ের সূচনা করেছিলেন। ১ মে ১৯৫৯ সালে ছবিটা মুক্তি পেয়েছিল। সেই হিসাবে অভিনয়ের এবছর ৬০ বছরে পা রাখতে চলেছেন। উত্তমকুমারও ৭১ বছর পার করে গেছেন অভিনয় জীবনে। যদিও তিনি আজ আমাদের পাশে নেই। আজ থেকে ৩৮ বছর আগে ১৯৮০ সালের ২৪ জুলাই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তবুও বাংলার মহানায়ক হিসাবে আজও তিনি বেঁচে আছেন বাংলার দর্শকদের মনে। আগামী দিনেও তিনি বাংলার মহানায়ক হিসাবেই বেঁচে থাকবেন। আর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আজও অভিনয় করে যাচ্ছেন। আমরা সৌমিত্রবাবুর অভিনয় আরও বেশি করে দেখার আশায় রইলাম। দশে আট, অর্থাৎ একদিকে উত্তমকুমার অপরদিকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এক সাথে অভিনয় করেছিলেন 'বিন্দের বন্দি' ছবিতে। পরিচালক ছিলেন তপন সিনহা আলি আকবর খাঁন ছবির সুরকার ছিলেন। ৮ জুন ১৯৬১ সালে ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল, আজ থেকে ৫৭ বছর আগে। সেই প্রথমবার একসাথে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তারপর এই সেরা অভিনেতা একসাথে অভিনয় করে গেছেন (২) অপরিচিত, (৩) স্ত্রী, (৪) যদি জানতেম, (৫) দেবদাস, (৬) পক্ষীরাজ, (৭) দর্পচূর্ণ, (৮) প্রতিশোধ ছবিতে। বাংলা সিনেমা যেমন থাকবে, সেই বাংলা সিনেমাতে উত্তম কুমার ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা বার বার উঠে আসবে। না হয় দশে দশ হয়নি। তবে দশে তো আট হয়েছে।

প্রবীর মিত্র
হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়